ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 563-575

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.044

বাস্তবের দর্পণে বীরভূমের গণনাট্য সংগঠন (১৯৬৯ - ২০২০) : উত্থান ও পরিণতি

ড. অঙ্কুশ দাস, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted:24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Birbhum district, modern theatre practice was started at the beginning of the last century at the hands of zamindars. Gradually, this new trend emerged from the dead bodies of the district's folk theatre. Initially, the control of this new theatrical genre was in the hands of the zamindars or the rich. However, due to changing socio-economic conditions, within the next few decades, this control started to shift to the hands of people from different strata of society.

After independence, district theatre practice started from adolescence to adulthood. The growing influence of the Left movement during this period created a fertile ground for Gananatya (IPTA—Indian People's Theatre Association) in the district. As early as the sixties, the first Gananatya branch, 'Rupantar Gosthi,' sprouted in Birbhum with a short life span.

After about ten years, the tide of Gananatya Sangha came to Birbhum district. Many Birbhum branches and preparation branches of the Gananyatya Sangha emerged one by one in the rural and urban areas of the district. Although branches also died prematurely at various times. Apart from the political influence, the changing social order of the last century and the following decades has played an important role in creating the context of this breakdown.

The Gananyatya Sangha's nearly forty-year footprint remains in the theatre practice of the entire Birbhum district. In this context, this separate article was written first on the beginning and consequences reasons for Birbhum's Gananatya Sangha will give a clear idea. An informative discussion of the political influence on the district Gananatya also reflects the West Bengal Gananatya Sangh.

Keywords: Theatre of Birbhum, Indian People's Theatre Association, IPTA of Birbhum Political Influence in West Bengal Theatre.

বাম সরকার ১৯৭৭ সালের এলেও উত্তাল সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালেই বীরভূম জেলার প্রথম গণনাট্যের শাখা 'রূপান্তর গোষ্ঠী' বোলপুরকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই রূপান্তর গোষ্ঠীর রাজ্য কমিটির অনুমোদন ছিল কিনা বা থাকলেও শাখা হিসাবে নাকি প্রস্তুতি শাখা হিসাবে ছিল তা তথ্যাভাবে বলা মুশকিল। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুজাতা লুনাবৎ ওরফে ফিনকি, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অঙ্কনের শিক্ষক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও প্রতিভা সিংহ রায়। সুজাতা দেবীর বাড়িতেই রূপান্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হত। কৃষক আন্দোলনের উপর 'রক্তে বোনা ধান' হল এই গোষ্ঠীর একপ্রকার প্রথম প্রযোজনা। নির্বাচনী প্রচারমূলক এই প্রযোজনা একাধিক গ্রামে উপস্থাপিত হয়। একবার পাঁচশোয়ার পালপাড়ায় 'রক্তে বোনা ধান' অভিনীত হওয়ার পরে ফেরার পথে সমাজবিরোধী বা দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে মারাত্মক জখম হন। বোমার আঘাতে গাড়ি চালকের একটি কান উড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুব সম্ভবত এটিই ছিল বীরভূম জেলায় নাট্যকর্মীদের উপর প্রথম রাজনৈতিক আক্রমণ। রূপান্তরের অন্যতম সারা জাগানো প্রযোজনা ১৯৬০ সালে প্রকাশিত মাক্সিম গোর্কি-র উপন্যাস 'দ্য মাদার' অবলম্বনে 'মা', যা প্রথম মঞ্চস্থ হয় বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মঞ্চে। মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সুজাতা লুনাবৎ। এছাড়াও এই রূপান্তরের অন্যান্য প্রযোজনাগুলি হল- জুলিয়াস ফুচিক (১৯৭০), কঙ্গোর কারাগারে (১৯৭০),রক্তাক্ত রোডেসিয়া (১৯৭৫) প্রভৃতি। সত্তরের দশকের প্রারম্ভে প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই নাট্যদলের নাট্যচর্চা বিবিধ কারণে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। নাট্যকর্মীদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণের ঘটনাও ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আবহে ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাত রূপান্তরের নাট্যচর্চা স্তিমিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজ্যে বাম সরকার আসার পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল হলে জেলায় গণনাট্য সংগঠনের কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে শুরু হয়। সেই সূত্রেই ১৯৮১ সালে ভারতীয় গণনাট্যের বীরভূম জেলার বোলপুর শাখা 'উত্তরণ' আত্মপ্রকাশ করে।[১] ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত উত্তরণই তখন জেলার একমাত্র অনুমোদিত গণনাট্যের শাখা। ১৯৮৬ সালে গণনাট্যের জেলা সভাপতি হন পাইকরের দুর্গাপদ ঘোষ, সম্পাদক হন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী ও জেলা কমিটির সদস্য হন দুবরাজপুরের মধুসূদন কুণ্ডু। মূলত এর পর থেকেই জেলায় গণনাট্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বীরভূমে ১৯৮৭ সালে ১ থেকে শাখা/দল সংখ্যা বেড়ে হয় ৪টি (উত্তরণ, রুদ্রবীণা, কস্তুরী, দুন্দুভি), প্রস্তুতি শাখা সংখ্যা হয় ৩টি (নলহাটি, মল্লারপুর ও দুবরাজপুর) এবং মোট সদস্য সংখ্যা হয় ১২৭টি।[২] মনে রাখতে হবে এই বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৫১টি পেয়ে তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসে।[৩] ১৯৮৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সিউড়ী শহরে প্রথম গণনাট্যের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা কমিটি ৪টি সভা করে। ১৯৮৮ সালে শাখা সংখ্যা বেড়ে হয় ৫ টি (দুবরাজপুরের ভিক্টরজারা প্রস্তুতি শাখা থেকে শাখা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়), প্রস্তুতি শাখা সংখ্যা হয় ৩টি (নতুন সংযোজন- মল্লারপুর) এবং মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮৩টি (শাখাগুলির সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন)।[৪] ১৯৮৮-৮৯ সাল নাগাত গণনাট্যের জেলা কমিটির সভাপতি হন দুর্গাপদ ঘোষ ও সম্পাদক হন মধুসূদন কুণ্ডু (শ্রী কুণ্ডু ২০০৯ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন)। ১৯৮৯ সালে দুর্গাপদ ঘোষ, মধুসূদন কুণ্ডু ও দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী গণনাট্যের রাজ্য কমিটির সদস্য হন। এই বছর সহ ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে জেলা কমিটি প্রতি বছর ৯টি করে সভা করে। ১৯৯২ সালে হয় ৫টি সভা। ১৯৯৩

সালে সিউড়ীতে নভেম্বর মাসের ৩ ও ৪ তারিখ গণনাট্যের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বছর অক্টোবর পর্যন্ত ৬টি সভা হয়। এই সময় গণনাট্যের শাখা ছিল ৮টি (নতুন-অনির্বাণ, কেতন, মাদল) ও প্রস্তুতি শাখা ছিল ১টি (ঘুড়িষা) এবং মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২২১ জন (শাখাগুলির সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন)। উল্লেখ্য এই সময়ে দুন্দুভি শাখা এবং মল্লারপুর, আমোদপুর, লাভপুর, নানুর ও রাজনগর প্রস্তুতি শাখাগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পরিসংখ্যানের বাইরে বেরিয়ে আমরা এই সময়ে বীরভূমের গণনাট্যের প্রকৃত অবস্থার দিকে একবার চোখ রাখার চেষ্টা করি। এই বিষয়ে ২য় সম্মেলনের জীর্ণ ও কীটদষ্ট প্রতিবেদনের মূল্যায়ন সর্বাপেক্ষা সহযোগী হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবেদনে যে কপি উদ্ধার হয়েছে তার বেশ কিছু স্থান জীর্ণ ও কীটদষ্ট হওয়ার ফলে কিছু শব্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রতিবেদনে থেকে জানা যাচ্ছে সেই সময়ে (১৯৯৩) বীরভূমে গণনাট্য সংঘের এমন অনেক শাখা ছিল যারা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাহায্য বা সহযোগিতা না পেলেও নিজেদের উদ্যোগে প্রশংসনীয় কাজ করছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তখনকার একাধিক সক্রিয় শাখাগুলির কাজ যে মোটেও আশানুরূপ ছিল না তাও স্পষ্টতই জানা যায়। প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে- 'এ ঘটনাও সত্য যে অনেক শাখা ও সদস্য ধারাবাহিক ভাবে সক্রিয় নয়। এঁদের কাজকর্ম অনেকটা দায়সারা গোছের। আর এক অংশের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব নেই বটে; কিন্তু উন্নতমানের নাটক-গান সৃষ্টিতে কিংবা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক শিবিরে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এরা নিজেদের উন্নীত করতে পারছে না। এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে সামগ্রিক ভাবে উন্নতমানের শাখার সংখ্যা কম'[৫]। পাশাপাশি শাখাগুলি পরিচালনাতেও এই সময় যে খামতি ছিল সেটিও প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়েছে- 'শাখাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষায়, শাখা সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে জেলা নেতৃত্বের বেশীর ভাগ সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার অভাবে ২-৩ জনের উপর সমস্ত বোঝা চাপে। ফলতঃ বিভিন্ন কর্ম্মসূচী গ্রহণের পর শাখায় সিদ্ধান্তগুলি অবহেলিত হয়'[৬]। এখান থেকেই স্পষ্ট যে ১৯৯৩ সালে জেলায় গণনাট্যের বিস্তার ঘটলেও সংগঠনের তৃণমূল স্তরে পরিকাঠামো মোটেও খুব একটা শক্তপোক্ত ছিল না। সাংগঠনিক সমস্যা বা খামতি নিয়ে জেলায় গণনাট্যের তৎকালীন সাব-কমিটিগুলির প্রসঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। নিম্নে সাব-কমিটিগুলি নিয়ে সেই সময় করা পর্যালোচনার অংশবিশেষ তুলে ধরা হল-

> 'রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত মত নাটক-গান অন্যান্য আঙ্গিক ও পত্রিকা এই চারটি সাব-কমিটির মধ্যে। নাটক-গান এই দুই সাব-কমিটি ছাড়া জেলা স্তরে আর কোন সাব-কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তব কতগুলি অসুবিধা এজন্য দায়ি। নাটক-গান ইত্যাদি রচনার প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব জেলা কমিটির। শাখা কমিটিগুলোকে বারবার নাটক-গানের দুটি করে কপি পাঠিয়ে অনুমোদন নিতে বলা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শাখা নিজেরাই অনুমোদনের কাজটা করে ফেলে। ফলতঃ গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করার পূর্বেই নাটক-গান প্রযোজনা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জেলা সাব কমিটি গঠন হবার পর আজ পর্যন্ত একটি সভাও হয় নি। শাখা থেকে নাটক-গানের অনুমোদন দেবার জন্য মাঝে মধ্যে এলেও যথা সময়ে আসে না এবং সাব-কমিটির ফাংসানিং এর অভাবে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়। আন্দোলনের পটভূমিতে আমাদের নাটকগুলি সাধারণতঃ লেখা হয়, ফলে অনুমোদন ঠিক সময়ে না হলে আন্দোলনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব আর থাকে না। অনেক সময় ১-২ জন জেলা নেতৃত্বকে দেখিয়ে অনুমোদন নেওয়া হয়। যান্ত্রিকভাবে শুধু অনুমোদন হল বা হল না এটুকু জানিয়ে দিলে নতুন সম্ভবনাময় উৎসাহী নাট্যকার

গীতিকাররা কিছুই লাভবান হন না। আমাদের দরকার নাট্যকার গীতিকারদের রচনার ত্রুটি দুর্বলতা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা।...'[৭]

উপরোক্ত অংশবিশেষ থেকে আরও একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, সেটি হল নিজেদের তৈরি নাটক ও গানগুলির অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে শাখাগুলির তীব্র অনীহা। এটা কি নিছকই সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য সমন্বয়ের অভাব? নাকি নেতৃত্বের কাছে নিজেদের তৈরি শিল্প বা শিল্পচর্চার তথা গান-নাটকের অনুমোদনের বিষয়টি নিয়ে প্রথম থেকেই শাখাগুলির মধ্যে তৈরি হওয়া প্রশ্ন, সংশয়, আপত্তির ও চোরা ক্ষোভের গোপন প্রতিফলন?

সেই সময় বীরভূম জেলার গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বদের সক্রিয়তা ও যোগ্যতা নিয়েও কি আভ্যন্তরীণ সমস্যা বা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল! আমরা ২য় সম্মেলনের প্রতিবেদনের 'জেলা সংগঠন' ও 'নাটক সম্পর্কে মূল্যায়ন' নিয়ে পর্যালোচনা অংশে তারই যেন ইঙ্গিত পায় হয়ত। সেখানে বলা হয়েছিল-

'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং এলাকাগত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘ হিসাবে আমাদের নিজস্ব কর্ম্মসূচী নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণের অন্যতম তাৎক্ষণিক(?) নাটক-গান ইত্যাদি নিয়ে প্রচারে অংশগ্রহণ করা। এজন্য নাট্যকার গীতিকারদের রচনাকর্মে ______(পড়া যাচ্ছে না) করতে হয়, এবং ভালো রচনাগুলিকে শাখার দ্বারা প্রযোজনা ও পরিবেশনার উদ্যোগ নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রত্যেককে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। শুধুমাত্র সার্কুলার দিলেই সব সময় কাজ হয় না। নাট্যকার গীতিকার শিল্পীদের যেমন নিজস্ব উদ্যোগ ও সৃষ্টির জন্যে বিপ্লবী আবেগ থাকা দরকার তেমনি তাদের মধ্যে উদ্যোগ ও আবেগ সৃষ্টির জন্যে আমাদের মত সংগঠনে নেতৃত্বেরও ভূমিকা থাকা দরকার।...সামগ্রিক ভাবে নাটক প্রযোজনার ব্যাপারে আমরা যে ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেছি-

১) নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক শিল্প ভাবনার অভাব। যেমন- অভিনয়, আলো, মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, আবহ ইত্যাদির ঠিকমত ব্যবহার।
২) নাটক প্রযোজনা করতে অনুশীলনের অভাব ।
৩) নাটকের বিষয় উপলব্ধি করতে না পারা।
৪) রাজনৈতিক ডাক এলেই নাটকের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, মহলা কক্ষে যাওয়া। তার মাঝে আর কিছু অন্য কাজ সেরে নিয়ে দায়সারা গোছের একটা প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে পারলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল হল বলে মনে করা। এ ধারণা ভ্রান্ত। অনুশীলন, চর্চা, পড়াশুনা ইত্যাদি করার ধারাবাহিকতা নেই। এসবের জন্য ধারাবাহিক ভাবে নাটক প্রযোজনাও করা যায় না।
৫) নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে অনুষ্ঠান প্রচার করার প্রবণতা। এবং এই ভাবে অনুষ্ঠান করাকেই মনে করি জনগণের মধ্যে আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব পালিত হল। জনগণের পছন্দ অপছন্দ বিষয় দেখি না। এই কারণে নতুন সৃষ্টির তাগিদও অনুভব করি না।'[৮]

অর্থাৎ বোঝায় যাচ্ছে ১৯৯৩ সাল নাগাত বীরভূম জেলায় গণনাট্যের বিস্তার হলেও সাংগঠনিক দুর্বলতা বা খামতি, সমন্বয়ের অভাব, শাখা ও প্রস্তুতি শাখার কর্মীদের সার্বিক সক্রিয়তার অভাব, গণনাট্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে জেলার প্রেক্ষিতে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ঘাটতি, সার্বিক ভাবে নাটকের গুণগত মানের অভাবের মত ফান্ডামেন্টাল কতগুলি সমস্যা ছিলই। কিন্তু ১৯৯৩ সালের পরবর্তী সময়কালে জেলায় গণনাট্যের অবস্থা বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই সমস্যাগুলি নিরসনের বদলে তা জেলার গণনাট্য

সংগঠনের অন্দরমহলে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই থেকে গিয়েছে শুধু তাইই না - উত্তরোত্তর সেগুলির শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয়ে সংগঠনের ভিত্ত নড়বড়ে করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৯১ সালে শাখা কমিটির অনুমোদন পাওয়া রামপুরহাটের গণনাট্যের শাখা 'কেতন' থেকে দলেই প্রতিষ্ঠাতা অমিতাভ হালদার জেলা স্তরের নেতৃত্বের সাথে মতানৈক্যের কারণে দল থেকে সরে এসে ১৯৯৮ সালে রামপুরহাটে নাইয়া দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২২শে মার্চ রেলমঞ্চে প্রথম প্রযোজনার প্রথম অভিনয়।[৯] এবং যে প্রযোজনা দিয়ে নাইয়ার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সেই 'হাজার চুরাশির মা' দেখার জন্য দর্শক ব্ল্যাকে টিকিট পর্যন্ত কেটেছিলেন।[১০] ব্ল্যাকে টিকিট কেটে নাটক দেখার নজির এখনও পর্যন্ত বীরভূমে বিরল। সন্দেহ নেই সংগঠনের আভ্যন্তরীণ একাধিক সমস্যার কারণে অমিতাভ হালদারের মত একাধিক যোগ্য নাট্যজনকে বীরভূম জেলার গণনাট্য হারিয়েছিল।

৯৩ সালের পরে ১৯৯৯ সালে হওয়া ৩য় সম্মেলনের প্রতিবেদন না পাওয়া গেলেও আমরা এই সময়ে বীরভূমে গণনাট্যের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০০২ সালে নলহাটিতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে পারি। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে ৩য় জেলা সম্মেলনে ১৯ জনকে নিয়ে মঞ্চ থেকেই জেলা কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সভায় একজনকে কো-অপ্ট করে জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা হয় ২০ জন। কিন্তু সম্মেলনের পরে ধারাবাহিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য শাখা স্তরে চলে যান ২ জন সদস্য। এছাড়াও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১ জন ও আরও ১ জন কারণ না দেখিয়ে পুনঃনবীকরণ করেন নি। রাজ্য কমিটির ২ জন সদস্য ছাড়া ১৪ জন জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন ২০০২ সালে। উল্লেখ্য এই সময় (২০০২-০৩) গণনাট্যের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন মধুসূদন কুণ্ডু। ৪র্থ জেলা সম্মেলনে জেলা কমিটির জন্য ২৩ জন সংখ্যার অনুমোদন হয়। সম্মেলন থেকে ২১ জন নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে সক্রিয়তা দেখে আরও দুজনকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টে নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুজন শাখা স্তরে চলে যান এবং একজনের আদর্শগত বিচ্যুতির কারণে পুনঃনবীকরণ করা হয়নি। ফলে পরবর্তী সম্মেলন (২০০৭ সালের ৫ম সম্মেলন) এলে দেখা যায় রাজ্য কমিটির তিনজন সদস্য বাদে জেলা কমিটির সদস্য ১৫ জন।

২০০২ সালের জেলায় গণনাট্যের অনুমোদিত শাখার সংখ্যা ও প্রস্তুতি শাখা/কমিটির সংখ্যা ১০টি করে।[১১] এই সময়ের নতুন শাখা হল- চিনপাইয়ের 'একতারা', পাঁচুইয়ের 'ঐক্যতান' ও খয়রাশোলের 'নির্মাণ'। ১৯৯৩ সালে প্রস্তুতি শাখার সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ১টি সেখানে ২০০২ সালে নতুন প্রস্তুতি শাখা হয় ১০টি। সেই প্রস্তুতি শাখাগুলি হল- নগরীর 'কোরক', রূপপুরের 'গণনিশান', কাপিষ্টার 'ছায়ানট', কুরুমগ্রামের 'ঝঙ্কার', বক্রেশ্বরের 'রাঙামাটি' (বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট), ইলামবাজারের 'প্রয়াস', বড়রা, মহম্মদবাজার, রাজনগর ও হেতমপুর। ১৯৯৩ সালে ঘুড়িষা প্রস্তুতি শাখা হিসেবে থাকলে ২০০২ সালে শাখা বা প্রস্তুতি শাখা হিসেবে তার নাম নেই। এক্ষেত্রেও শাখা হিসাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়াই মূল কারণ আশা করি। এই সময়ে প্রস্তুতি শাখাও অনেকগুলিই বেড়েছে। যা থেকে এই সময়ের গণনাট্যের বিস্তার বোঝা যায়। কিন্তু বিস্তার তুলনামূলক ভালো হলেও প্রশ্ন থেকেই যায় শাখা ও প্রস্তুতি শাখা/কমিটিগুলির স্বাস্থ্য কেমন ছিল? ২০০২ সালে সম্মেলনের প্রতিবেদনে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সেখানে বলা হচ্ছে – 'কয়েকটি শাখা/প্রস্তুতি কমিটি নিয়মিত কাজ করেছে, কাজগুলির মান সম্পর্কে সমালোচনা হয়ত আছে কিন্তু আন্তরিক ভাবে, ভাল কাজ করার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার এটাও

লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশ কিছু শাখা প্রস্তুতি কমিটি ধারাবাহিক ভাবে নিষ্ক্রিয়। নির্বাচনের সময় এদের মধ্যে খানিকটা সচলতা দেখা যায়। স্থূলমানের প্রোডাকশন নিয়ে কিছু অনুষ্ঠান এবং কিছু দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে গণনাট্য সংঘের কর্তব্য পালন করছেন বলে মনে করেন। সারাবছর কোন শিল্পকর্ম করেন না বললেই চলে।...সময়ের দাবির তুলনায় পর্যাপ্ত না হলেও বিগত বছরগুলিতে রুদ্রবীণা/ভিক্টরযারা/উত্তরণ/মাদল/অনির্বাণের মত শাখাগুলির গান, নাটকের ক্ষেত্রে কয়েকটি উন্নতমানের প্রোডাকশন জেলার গর্ব বলে আমরা মনে করি। নাটকের ক্ষেত্রে রুদ্রবীণা শাখার ‘রোশনারার বন্দুক’, ‘একবচন বহুবচন’, ভিক্টরজারা-র ‘দ্বাদশ ভক্ত্যা চাডুম’, ‘অথ কৃষ্ণ কথা’ ঘোষণা পত্রের মূল সূত্র ও সুরকে ধরে প্রযোজনা উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই প্রযোজনাগুলি নির্মাণের জন্য যে উদ্দীপনা, শ্রম শাখার সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার ধারাবাহিকতা থাকেনা’[১২।] অর্থাৎ হাতেগোনা পরিচিত কয়েকটি শাখা ছাড়া গুণগত মানের বিচারে কোন শাখাই যে সেভাবে প্রযোজনা নির্মাণ করতে পারেনি তা স্পষ্ট। বীরভূমে গণনাট্যের সাংগঠনিক অবস্থার কথাও আমরা জানতে পারি এই প্রতিবেদন থেকে। বলা হচ্ছে– ‘বিগত সম্মেলনের পরে প্রযোজনা ও পরিবেশনার উতকর্য সাধনের জন্য আমরা সংগীত, নাটক, পত্রিকা এবং পরবর্তীকালে প্রচার ও প্রকাশনা মোট চারটি উপসমিতি গঠন করেছিলাম। প্রথমদিকে সংগীত ও নাটক উপসমিতি দুটি কিছুটা সক্রিয় হলেও ধারাবাহিকতা থাকেনি। সার্থক পরিকল্পনা রচনা ও শিল্প সৃজনের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপসমিতিগুলির সক্রিয়তা জেলা কমিটির কর্মসূচী রূপায়নে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করতে পারে। কিন্তু জেলাকমিটি ও শাখাগুলির সাথে উপসমিতিগুলির পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপিত না হওয়ায় উপসমিতিগুলি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে নি।[১৩]...’ তাহলে ১৯৯৩ সালে জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনে বীরভূম জেলার গণনাট্য সংঘের সংগঠনে যে যে দুর্বলতাগুলি ছিল সেগুলি নয় বছর পরেও ২০০২ সালেও বর্তমান ছিল। বিশেষত সংগঠনের অভ্যন্তরে সমন্বয়ের অভাব যার প্রভাব কোথাও গিয়ে শাখাগুলির উপরেও পড়ে ছিল নিশ্চই। বলা বাহুল্য এই অভাব বা সমস্যা পরবর্তী দশ বছরে নিরসন হওয়ার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে গণনাট্যের বীরভূম জেলার ৫ম সম্মেলনে মুদ্রিত খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় (নাকি আত্মসমালোচনা?) বলা হয়েছে- ‘উদ্বেগের বিষয় হলো সম্মেলন আসে, সম্মেলন যায়। সম্মেলনের আগে, ভোটের আগে আমারা একটু বেশী নড়েচড়ে উঠি। সম্মেলনে গৃহীত প্রতিবেদন বাস্তবে কতটুকু কার্য্যকরী হয়। আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই, দেখবো একই কথা – একই আলোচনা – একই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আমরা বারংবার করে চলেছি। কেউ কেউ গৃহীত প্রতিবেদন অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছেন। ঘোষণা পত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন করে ভাবছেন, কিন্তু সামগ্রিক চেহারা তা নয়। ঘোষণাপত্রকে সামনে রেখে একসাথে ভাবার, একসাথে কাজ করার দৈন্যতা যদি আমাদের থেকে যায়। সর্বোপরি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে পা ফেলার সত্যিকারের কোন সদিচ্ছা যদি আমাদের না থাকে গুলিয়ে দেওয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো কি।’[১৪] উপরোক্ত এই অংশেই বোধ করি জেলা গণনাট্যের তৎকালীন অবস্থা ফুটে উঠেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে পুরানো ব্যাধি নিরাময়ের বদলে ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে। এমনকি ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনে পূর্ব প্রতিবেদনগুলির মত শাখা বা প্রস্তুতি শাখা সৃষ্ট নাটক ও গানের কোন তালিকা তো নেইই উল্টে নাটক ও গান নিয়ে কোন পর্যালোচনাও করা হয়নি। ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনে নাটক ও গানের এমন অনুপস্থিতি কি কেবলই অসচেতনতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত? নাকি জেলা কমিটির সাথে শাখাগুলির দুর্বল যোগাযোগের ফলে অথবা অধিকাংশ শাখার

সক্রিয়হীনতার ফলে শাখা বা প্রস্তুতি শাখা অভিনীত নাটকের তালিকা জেলা কমিটির কাছে না পাঠানো? এরই উত্তর আমরা পাই উক্ত প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছিল-

'সংখ্যার বিচারে আমরা কিছুটা এগিয়েছি। কিন্তু ভালো সংগঠন শুধু সংখ্যার বিচারে হয়? ভালো সংগঠন গড়তে গিয়ে আমরা কোন কোন সমস্যার মুখে পড়ছি – এই প্রশ্নের উত্তর সেদিনও যা ছিল আজও তাই আছে।

১) সম্পাদকমণ্ডলী – জেলা কমিটি – শাখা কমিটির যোগাযোগ দুর্বল।

২) উপসমিতিগুলি সক্রিয় নয়।

৩) শাখাগুলি শাখার সভার রিপোর্ট বা কাজ কর্মের রিপোর্ট জেলা কমিটিতে দেন না।

৪) অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাখার শিল্পীদের রচিত নাটক-গান জেলায় জমা পড়ে না।

৫) জেলা কমিটির অধিকাংশ সদস্য দায়িত্ব পালনে অজুহাত খোঁজেন। সভা কম হয়, হলেও গড় উপস্থিতি ৬ থেকে ৮ জন। সম্পাদক মণ্ডলী ভাল ভাবে হয় নি নিয়মিত উপস্থিতি না থাকায়।

৬) অধিকাংশ সদস্য অন্যান্য সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকায় গণনাট্য সংঘে সময় দিতে পারছেন না।

৭) অধিকাংশ শাখার সভা প্রায় হয় না। হলেও দায়সারা গোছের। জেলার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও উদাসীনতা দেখা যায়।

৮) সংগঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যের ধারণা পরিষ্কার নয়।

৯) অধিকাংশ শাখায় জেলা থেকে দেওয়া ইস্যু ভিত্তিক অর্থকোটাও দেন না।

১০) সমস্ত স্তরের তহবিলের অবস্থা খুবই খারাপ।'[১৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে সূচনার দিনগুলি থেকে বীরভূমের গণনাট্য সংঘ যে সকল সমস্যায় জর্জরিত সেগুলি ২০০৭ সালে এসেও প্রাসঙ্গিক – বরং বেশী করে প্রাসঙ্গিক হয়ে বোধ হয় মহামারীর আকার নিয়েছিল। কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল জেলাতে গণনাট্যের দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছরের যাত্রা পথের পরেও যখন মূল সমস্যাগুলির মধ্যে গণনাট্যের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যদের পরিষ্কার ধারণার অভাব দেখা দিচ্ছে তখন বিস্মিত হতে হয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আদর্শগত ভাবে কি করে একটি কর্মকাণ্ডের সাথে সার্বিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল? বা আদেও সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে স্থাপিত হয়েছিল কি না? নাকি হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া (সম্ভবত যাদের জন্য এত খামতি থাকার পরেও সংগঠন সচল ছিল) সিংহভাগ সদস্যই গণনাট্যের সাথে হুজুগে পড়ে বা অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ভিড়েছিল? তার জন্য সংগঠন ও শাখা স্তর ছাড়াও প্রযোজনার গুণগত মানেও কি প্রভাব পড়েছিল? এর উত্তরও লুকিয়ে আছে ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনেই। সংগঠন নিয়ে পর্যালোচনায় সেখানে বলা হচ্ছে–

> 'আমাদের সংগঠনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউই প্রায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার বা গীতিকার এমনটা নয়। লড়াইয়ের ময়দানে অংশ গ্রহণের জন্য চাপে পড়ে গান বা নাটক লেখেন, অভিনয় করেন, সংগীত পরিবেশন করেন। তাতে কাজও চলে যায়। ইস্যু ভিত্তিক প্রয়োজনটুকু হয়ত মিটেও যায়। কিন্তু যে আক্রমণের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে তাকে কি এইভাবে মোকাবিলা করা যায়।... একজন শিল্পী যদি

নিজেকে গড়ে তোলার তাগিদ প্রতিনিয়ত নিজের ভিতর থেকে না অনুভব করেন তাহলে তাঁকে কি কোন ছাঁচে ফেলে শিল্পী করে দেওয়া সম্ভব। আর শিল্পকর্মের প্রতি রাজনৈতিক ভাবেই দায়বদ্ধতা না থাকলে ভাল শিল্পকর্মও সম্ভব না।... শিল্পী নয় আবার ঘোষণাপত্রের মর্মবস্তুও অনুধাবন করতে পারে না এরকম কিছু সংগঠকরা কারণে অকারণে ছড়ি ঘোরালে যেমন সহ্য করা যায় না তেমনি দুচারটে গান অথবা দু একটা নাটকে নেতৃত্বের প্রশংসা পাওয়া শিল্পীর ধরাকে সড়া জ্ঞান করার ঔদ্ধত্যও গণনাট্য আন্দোলনের বিকাশের পরিপন্থী। মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুলতে পারলেও এ ঝোঁক কাটানো সম্ভব নয়।'[১৬]

তাহলে একদা জোয়ারের সময় গণনাট্যে কি বেনোজল প্রবেশ করেছিল? ২০০৭ সালে সেই জলেই কি বীরভূমের গণনাট্যের তরী কার্যত বেসামাল হয়ে পড়ে? সেই বেসামাল তরীর পালেই কি আদর্শ সম্পর্কে অপরিষ্কার ধারণা দমকা হাওয়ার মত আছড়ে পড়ে? উত্তর যাইহোক না কেন এই সময়েই জেলার গণনাট্যে যে গভীর সঙ্কটের চোরাস্রোতের মুখোমুখি হয়েছিল সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, জেলার গণনাট্য আদেও আক্ষরিক অর্থে আপাদমস্তক গণনাট্য সংঘের আদর্শে বিশ্বাসী এক নাট্য তথা সাংস্কৃতিক সংগঠন হয়ে উঠতে পেরেছিল কিনা? নাকি রাজনৈতিক আদর্শের আড়ালে তা হয়ে উঠেছিল স্রেফ বাম সরকারের এক সাংস্কৃতিক সংগঠন? যে সংগঠন দলীয় রাজনীতির চক্রব্যূহে নিজেদের সত্তা বিকশিত করার বদলে অচিরেই নিজেদের ইজ্জত খুয়িয়েছে! যদি তা নাহয়ে থাকে তাহলে ২০১১ সালে রাজ্যে বাম সরকারের পতনের সাথে সাথেই বীরভূমে গণনাট্যের শাখাগুলি দ্রুত নিষ্ক্রিয় হতে হতে কেন মুখ থুবড়ে পড়ল? দলীয় রাজনীতি যখন স্বাধীন শিল্প চর্চার উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েমে সাফল্য পায়, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যখন নাট্য বিশেষজ্ঞের মত পাণ্ডুলিপির অনুমোদন সহ প্রযোজনাকে ময়নাতদন্তের টেবিলে শোয়ায় তখন অলখ্যে চিতা সাজাতে থাকে সময়। সেই সাজানো চিতা অপেক্ষা করে কেবলমাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের। ২০১১ সালের ৩৪ বছরের বাম সরকারের পতন সেই স্ফুলিঙ্গের কাজটাই করেছিল বোধহয়। যদিও ২০১১ সালের আগে ২০০৭-০৮ সাল থেকেই যখন বাম বিরোধী আন্দোলন তীব্র হতে হতে ক্রমে পাড়ার চায়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন থেকেই মনে হয় বীরভূমে গণনাট্যের শাখাগুলিতে দ্রুত ধস নামতে শুরু করে। ২০১২ সালের ২রা ডিসেম্বর বোলপুর টাউন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হওয়া গণনাট্যের বীরভূম জেলা কমিটির ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনের 'সাংগঠনিক পর্যালোচনা'-তে বিভিন্ন স্তবকে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। 'সাংগঠনিক পর্যালোচনা'-র 'শাখা সংগঠন' উপবিভাগের প্রথম স্তবকেই বলা হয়েছে-

'শাখার অনেক সদস্য ধারাবাহিক সক্রিয় নন। এঁদের কাজকর্ম অনেকটা দায়সারা গোছের। আর একটা অংশ আছেন যাদের মধ্যে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার অভাব নেই ঠিকই কিন্তু উন্নতমানের নাটক – গান সৃষ্টিতে কিংবা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এরা নিজেদের সেভাবে উন্নীত করতে পারছে না। গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব শর্ত হ'ল আমাদের প্রত্যেকটি কর্মীকে হতে হবে একাধারে শিল্পী, শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সৃজনশীল সংগঠক হতে হবে। আমাদের কর্মীরা এদিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।'[১৭]

অর্থাৎ ২০১২ সালে বীরভূমের গণনাট্য শাখার সদস্যদের ধারাবাহিক সক্রিয়তার অভাবের যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা নিশ্চই হঠাৎ করে ২০১১ সালের পালা বদলের সাথে সাথেই হয়নি। নিঃসন্দেহে তার সূচনা আগে থেকেই হয়েছিল। সেই সাথে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার…' যে শর্তাবলীর কথা বলা হয়েছে তা বীরভূমে কতটা প্রযোজ্য ছিল বা আদেও ছিল কিনা? ভেবে দেখার মত বিষয় যে, অন্তত শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সৃজনশীল হওয়ার জন্য যে চর্চার প্রয়োজন তা কতজন গণনাট্যর কর্মী অথবা যাদের হাতে নাটক ও গান অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল তাদের সবার মধ্যে প্রকৃত অর্থে বর্তমান ছিল কিনা - সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়না কি! অন্তত যাদের ভিতরে শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও সৃজনশীলতা আছে তারা নিজেদের শিল্পের অনুমোদনের জন্য কেনই বা অপরকে অনুমোদন দেবেন বা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করবেন? অপর দিকে যাদের মধ্যে প্রকৃত শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বর্তমান তারা নিজেরাই বা কেন শিল্প অনুমোদনকারী হবেন? শিল্পচর্চা বা বিশেষত নাট্যচর্চার প্রতি নেতৃত্বের অনুমোদন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শাখাগুলির কর্মীরা যে মোটেও স্বচ্ছন্দ নন বা নিজেদের স্বাধীন ভাবতে পারতেন না তার ইঙ্গিত মিলেছে পূর্বোক্ত 'শাখা সংগঠন' উপবিভাগেই। প্রতিবেদনের এই অংশের দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে-

> 'যে সব শাখা পুনর্নবীকরন করে নি তার কারণ এলাকার নেতৃত্বের অভাব, নেতৃত্ব সময় দিতে না পারা। সাধারণ সদস্য ও কর্মীরা গণনাট্য সংঘের কাজ করার চাইতে গণনাট্যের বাইরে সংঘের ভাবাদর্শ অনুযায়ী সংস্কৃতির কাজ করতে বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এবং সেখানে তাঁরা নিজেদের স্বাধীন শিল্পী মনে করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির কাছে তাদের কোনরকম কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গুরুত্ব থাকে। কোন চাপ থাকে না।'[১৮]

নেতৃত্বে চাপে অথবা নাটক ও গানের অনুমোদন সংক্রান্ত বেড়াজালে গণনাট্যের বীরভূম জেলার শাখাগুলির সদস্যদের সমস্যার কথা ভেবে এটা কি আত্মসমালোচনা? নাকি জেলায় গণনাট্যের সঙ্কটের সময় ব-কলমে সদস্যদের রাজ আদর্শ মনে করিয়ে দেওয়া? কারণ যাই হয়ে থাকুক না কেন এটা স্পষ্ট যে, সে সময়ে (২০১২ সাল) বীরভূমের গণনাট্যের সাধারণ সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে যে স্বাধীন শিল্পী মনোভাব, স্বচ্ছন্দ বোধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির (বাস্তবে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব?) কাছে কৈফিয়ৎ না দিয়ে চাপমুক্ত হওয়া প্রাসঙ্গিক হয় বা গুরুত্ব পায়। তাহলে এতদিন ধরে শাখাগুলি হতে সৃষ্ট নাটক ও গানের অনুমোদন পাওয়া বা নেওয়া সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে জেলার গণনাট্যের কর্মীদের একাংশের মধ্যে কি ক্ষোভ বা অসন্তোষের জন্ম হচ্ছিল? যে ক্ষোভ বা অসন্তোষকে এতদিন সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি! পালা বদলের ধাক্কায় সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সেই ক্ষোভ বা অসন্তোষকেই কি গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করতে বাধ্য হয় তৎকালীন নেতৃত্ব? একি ছিল বিলম্বিত বোধোদয়? তারই ইঙ্গিত কি প্রতিবেদনের উপরোক্ত অংশে ছিল? ২০১২ সালের ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বীরভূমে গণনাট্যের বেহাল দশা। কেবলমাত্র রুদ্রবীণা (সিউড়ী), গণকণ্ঠ (সিউড়ী) ও উত্তরণ (বোলপুর) শাখাই বাস্তবে সক্রিয়। বস্তুত বাম সরকার পতনের ধাক্কা সামলে এই তিনটি শাখাই তখন বাস্তবে কিছুটা হলেও সক্রিয় ছিল। জেলার আরও এক গুরুত্বপূর্ণ গণনাট্যের সক্রিয় শাখা দুবরাজপুরের 'ভিক্টরজারা' প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে –

> 'দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ শাখা খুবই নিষ্ক্রিয়। শাখায় কাজ করেন এমন জেলা কমিটির সদস্য ৫ জন। ২ জন শুধুমাত্র জেলার মিটিং-এ আসা ছাড়া কোন কাজ করেন না। কোন কোন সময় জেলা কমিটির

মিটিং এ সকলে এলেও শাখায় কোনরকম কাজে তাঁরা থাকেন না।... প্রাক্তন জেলা সম্পাদক এই শাখায় নাটক পরিচালনার কাজ করতেন এবং শাখার প্রতিটি আন্দোলন কর্মসুচীতে তার উদ্যোগ ও উপস্থিতি শাখার কাজে গতি আনতো। বর্তমানে জেলা কমিটির সদস্য সহ শাখার পুরানো সদস্যরা নিষ্ক্রিয়।'[১৯]

এখানে প্রাক্তন জেলা সম্পাদক হিসেবে কারুর নাম উল্লেখিত না হলেও তিনি যে দুবরাজপুরের মধুসূদন কুণ্ডুই ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। প্রতিবেদনের বয়ান অনুসারে শ্রী কুণ্ডু ২০০৯ সালে 'তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণ জানিয়ে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে জেলা কমিটিকে চিঠি লেখেন। জেলা কমিটির সভায় তাঁর অব্যাহতির কারণকে বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে অব্যাহতির আবেদনকে গ্রহণ করা হয়'। তবে বাস্তবে নেতৃত্বের সাথে মনোমালিন্যের জন্যই মধুসূদন কুণ্ডু যে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা অনুমান করাই যায়। বস্তুত ওই সময় থেকেই বীরভূম জেলার গণনাট্য সংগঠন সম্পাদকহীন হয়ে যায়। তখন থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগঠনের সহ সম্পাদকই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। সম্ভবত সেই সময় সহ সম্পাদক ছিলেন অনিরুদ্ধ ঘোষাল (উত্তরণ, বোলপুর)। ভেবে দেখার মত বিষয় ২০০৬ সালে যেখানে বীরভূম জেলায় ১৩টি শাখা এবং ৯টি প্রস্তুতি শাখা ছিল এবং ২০১২ সালে খাতায় কলমে যেখানে ১২টি শাখার ১৭৬ জন সদস্য ছিল সেখানে ২০০৯ সালে জেলা সম্পাদকের পদটি শূন্য হওয়ার পরে অন্তত তিন বছরেও তা পূরণ করার জন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান মেলেনি। নেতৃত্ব নিয়ে অনুযোগ প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে-

'সভাপতি পার্ট টাইমার। তিনি কলকাতায় থাকেন। মাঝেমধ্যে মিটিং ও অন্যান্য সাংগঠনিক প্রোগ্রামে থাকেন। সুভাষ ব্যানার্জী, দেবীদাস আচার্য, মানিক পাণ্ডে ও অর্ক সেন এই ৪ জন জেলা কমিটি সদস্য পুনর্নবীকরণ করেন নি।'[২০]

যতদূর জানা গেছে সেই সময় সভাপতি পদে ছিলেন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী। এছাড়াও কোরক (নগরী), অঙ্গীকার (বড়রা), পূর্বকোণ (রাজনগর), অনির্বাণ (নলহাটি), ঐক্যতান (পাঁড়ুই), নির্ভীক (কীর্ণাহার), মাদল (খুজুটিপাড়া), খোলাচোখ (সাঁইথিয়া) শাখাগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে ২০১২ সালেই বীরভূম জেলার গণনাট্যের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। ২০১২ সালের ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের পরে এই পরিস্থিতি যে আরও দ্রুত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল তার জন্য ৭ম জেলা সম্মেলনের কোন প্রতিবেদন এখনও পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ৮ হতে ৯ তারিখ পর্যন্ত নদীয়ার কল্যাণীতে হওয়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গের ১৫তম রাজ্য সম্মেলে মূল্যায়নের জন্য প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র সংকলনে দেখা যায় বীরভূম জেলা থেকে গানের কোন তালিকা বা মূল্যায়ন সম্ভবত পাঠানো হয়নি অথবা সে বছর ৭ম বীরভূম জেলা সম্মেলনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গান তৈরি সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি বা দেওয়া যায়নি। তাই কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া বাকি জেলাগুলির মত বীরভূমের গণনাট্যের শাখা হতে সৃষ্ট নির্বাচিত কোন গান রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে বা মূল্যায়নে স্থান পায়নি। অবশ্য বীরভূমের গণনাট্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো মাত্র ৪টি প্রযোজনা রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছিল। প্রযোজনাগুলি হল– মরাচাঁদ, ধনপতি উপাখ্যান, জলদেবতা ও রঙিনের ঠাম্মি ও সন্ধ্যাতারা।[২১] কিন্তু প্রযোজনাগুলি জেলার কোন কোন শাখা হতে অভিনীত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই। আরও একটি

পরিসংখ্যান ২০১৭ সালে বীরভূমে গণনাট্য সংগঠনের অবস্থা বোঝাতে সহায়ক হবে। ২০১২ সালে জেলায় গণনাট্য পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ছিল ১২৫টি সেখানে মাত্র চার বছরের মাথায় ২০১৬ সালে সেই সংখ্যা শুন্যতে গিয়ে ঠেকেছিল। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে বলাই যায় ২০১২ সালে জেলার গণনাট্যের যেকটি শাখা আশঙ্কাজনক ভাবে ধুঁকছিল তারা ২০১৭ সালের মধ্যেই বাস্তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অথবা প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ভয়াবহ রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায় ২০০৭-০৮ সালেই। সেই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বিপর্যয় শুরু হয় তা আর ঠেকানো যায়নি। বাম সরকারের উত্থানের সাথে সাথে বীরভূম জেলায় গণনাট্য সংঘের উত্থান ও বিস্তারের সে সমানুপাতিক সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সমানুপাতিক সম্পর্কের সমীকরণের পথেই বাম সরকারের পতনের সাথে সাথেই বীরভূম জেলায় গণনাট্য সংঘের পতনের পথ প্রশস্ত হয়। তথাপি গণনাট্য সংঘের জন্য জেলা বীরভূমের নাট্যচর্চা বেশ কিছু ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছিল। আশির দশক থেকে প্রচলিত মঞ্চ ভাবনার বাইরে নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় তাতে গণনাট্যের শাখা ও প্রস্তুতি কমিটিগুলির মাঠে ময়দানে অভিনয় করা নাটকগুলির অবদান অস্বীকার করা যায়না। জেলার পথ নাটকের ক্ষেত্রেও কোথাও গিয়ে গণনাট্যের এই প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও বাজার চলতি বা কলকাতায় মঞ্চ সফল প্রযোজনাগুলি যখন নিয়মিত জেলায় অভিনীত হচ্ছে তখন এই আবর্তের বাইরে বেরিয়ে জেলায় নাট্যরচনার যে জোয়ার আশির দশকে লক্ষ্য করা যায় তাতে গণনাট্যের কর্মীদের দ্বারা রচিত নাটকগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই নাটকগুলির গুণগত মান নিয়ে পর্যালোচনার অবকাশ থাকলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সেই সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের সাধ্যমত নাট্যরচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেলায় নাট্যরচনার আঙিনায় এত সংখ্যক মানুষের বিভিন্ন স্তর থেকে আগমন ইতিপূর্বে বীরভূম দেখেনি। নতুন নাট্যকারদের আগমনের এই ধারায় জেলার গণনাট্যের স্মরণীয় অবদান ছিলই। এবং সেই অবদান কোথাও গিয়ে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি প্রচলিত গ্রুপ থিয়েটার যখন জেলার শহর, শহরাঞ্চল ও গঞ্জগুলোতেই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন রাজনৈতিক প্রভাব ও বিস্তারের ফলে সহজেই গণনাট্য পৌঁছে গেছে বীরভূম জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। বস্তুত জেলার এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে ধারাবাহিক ঐকান্তিক (সিরিয়াস) নাট্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছে গণনাট্য। হতে পারে তারা একাধিক স্থানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি, হতে পারে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, হতে পারে রাজনৈতিক কারণেই তারা সেই চেষ্টা চালিয়েছিল, হতে পারে বিভিন্ন কারণে সেই সব এলাকাগুলিতে একটি সম্ভবনার অপমৃত্যুও হয়েছে – কিন্তু তাই বলে তাদের সেই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। বরং তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। মহম্মদবাজার, খয়রাশোল, রাজনগর, ময়ূরেশ্বরের মত প্রভৃতি এলাকাগুলিতে যেখানে স্বাধীনতার আগে ও পরে নাট্যচর্চা সেভাবে বিকশিত হওয়ার কোন তথ্য সংগৃহীত হয়নি বললেই চলে সেই এলাকাগুলিতে গণনাট্য অন্তত ধারাবাহিক নাট্যচর্চা তথা সাংস্কৃতিক চর্চার চেষ্টা চালিয়ে ছিল।

বীরভূম জেলার গণনাট্য প্রসঙ্গে আর দু একটি কথা বলে এই প্রবন্ধের ইতি টানবো। যে বাম সরকারের উত্থানের সাথে সাথে বীরভূমের গণনাট্যের একাধিক শাখার জন্ম বা উত্থান হয় এবং সেই সরকার পতনের সাথে সাথে যখন শাখাগুলিও মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে অথবা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় তখন এই প্রেক্ষিতে

প্রশ্ন থেকেই যায় আগামী দিনে বামেরা রাজ্যপাটে প্রত্যাবর্তন করলে বীরভূমেও গণনাট্যের প্রত্যাবর্তন হবে কিনা? যদি হয় তাহলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সংগঠন তৈরি ও পরিচালনার নীতিমালার কোন পরিবর্তন হবে কিনা? নাকি পূর্বের মতই সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার মত স্বাধীন শিল্পকে আদর্শের ঘুঙুর পরিয়ে অনুমোদন দেওয়া বা না দেওয়া পথে হেঁটে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে!

তথ্যসূত্র:

১) রায়, স্বপন; ‘নাটক ও নাট্যচর্চায় বীরভূম-একটি অনুসন্ধান’, পশ্চিমবঙ্গ (বীরভূম জেলা সংখ্যা); সম্পা. সুখেন্দু দাস; ১৪১২ বঙ্গা., মাঘ; পৃ. ২৩৬।
২) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ২য় সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, নভেম্বর, ১৯৯৩; পৃ. ৫।
৩) Statistical Report on General Election 1987 to The Legislative Assembly Of West Bengal; Election Commission Of India (New Delhi).
৪) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ২য় সম্মেলন; ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, সিউড়ী, নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৫।
৫) তদেব, পৃ. ৫।
৬) তদেব, পৃ. ৮।
৭) তদেব, পৃ. ১০।
৮) তদেব, পৃ. ৮-১৩।
৯) ‘নাইয়া-র নাটক’, গণশক্তি, ২৮শে মার্চ (রবিবার) ১৯৯৯ , পৃ. ৫।
১০) ‘হাজার চুরাশির মা ও বে-নজীর ঘটনা’, দিনান্ত, ৮ই এপ্রিল (বৃহস্পতি) ১৯৯৯, পৃ. ৩।
১১) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৪র্থ সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, নলহাটী, নভেম্বর, ২০০২, পৃ. ১৬।
১২) তদেব, পৃ. ১৭।
১৩) তদেব, পৃ. ২২।
১৪) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৫ম সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, চিনপাই, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৫।
১৫) তদেব, পৃ. ৮।
১৬) তদেব, পৃ. ৫-৬।
১৭) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৬ষ্ঠ সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, বোলপুর, ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ৪।
১৮) তদেব।

১৯) তদেব, পৃ. ৫।
২০) তদেব, পৃ. ৬।
২১) মূল্যায়ন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (পঃ বঃ) রাজ্যের ১৫তম সম্মেলন, কল্যাণী, নদীয়া, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) চৌধুরী, অরুণ, 'বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: গঠন ও ব্যক্তিত্ব', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. (কলকাতা), ২০১৪।
২) মিশ্র, শৈলেণ, 'সত্তরের ডায়েরি', বীরুজাতীয় (বীরভূম), জানুয়ারি, ২০২০, ৯৭৮৮১৯৪৪৩৫২২৮।
৩) মজুমদার, অর্ণব, 'বীরভূম: ইতিহাস ও সংস্কৃতি', আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৯, জানুয়ারি; ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১।
৪) জিন্না, জুলফিকার, 'থিয়েটারচেতনা যুক্তি-তক্কো-অভিমুখ', বীরুজাতীয়, বীরভূম, ২০২৩, জানুয়ারি; ৯৭৮৯৩৯১৭৩৬৩৪৭।
৫) রায়, শিবনারায়ণ, 'শান্তিনিকেতন: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ', মূঢ়তা থেকে মানবতন্ত্রে; রেনেসাঁস পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা, ২০০৬, জানুয়ারি।
৬) সরকার, সলিল, 'কলকাতার নাট্যমঞ্চ বাংলার নাট্যকথা', বইওয়ালা বুক ক্যাফে, শান্তিনিকেতন, ২০২৩।
৭) সাহা, কমল, 'বাংলা নাট্যকোষ' (১ম খণ্ড), বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪, ডিসেম্বর, ৯৭৮৯৩৮২৭০৬৬১৮।
৮) কুমার, দাস, অপূর্ব; গণনাট্য সংঘ, 'কেতন শাখা প্রযোজনা মা', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ১৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৭।
৯) ঘোষ, মলয়, 'বীরভূম জেলার নাট্যচর্চা: একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা', ১৮তম নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সম্পা. শেখর সমাদ্দার, ২০২১।
১০) চট্টোপাধ্যায়, গনেশগোপাল, 'কড়িধ্যার নাট্যচর্চা', সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, সরস্বতী সমিতি, কড়িধ্যা, সম্পা. সুভাষ দত্ত, ১৩৯২।

তথ্যদাতা:

- কামদেব গোস্বামী, মধুসূদন কুণ্ডু, অনিরুদ্ধ ঘোষাল, মলয় ঘোষ, জুলফিকার জিন্ন, অধ্যাপক অসীম চট্টরাজ বিশ্বজিৎ দাস, তাপস দত্ত, স্বপন রায়, সংঘমিত্রা ঘোষ, অধ্যাপক তারক সেনগুপ্ত, অতনু বর্মণ প্রমুখ।